মঙ্গলবার, ১৩ কার্তিক, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ৩০৯

জঙ্গি হানায় রক্তস্নাত সোমালিয়া, বিশ্বজুড়ে নিন্দা

মাত্র ১৪ দিনের মাথায় ফের জঙ্গিদের বর্বরোচিত হামলায় সোমালিয়ায়র ওই রাজধানী মোগাদিসুতে ২৩ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রাজধানীর জনবহুল এলাকায় জঙ্গিরা বিস্ফোরক বোঝাই আত্মঘাতী গাড়ি নিয়ে এক বিশাল বহুতল হোটেলে ভয়ঙ্কর হামলা চালায়। শনিবার থেকে অবরুদ্ধ হোটেলের ভেতরে ও বাইরে সোমালিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের টানা গুলির লড়াই চলে। জঙ্গি আক্রমণে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ নাগরিক। এই হামলায় দায় স্বীকার করেছে আফ্রিকার জঙ্গি সংগঠন আল-সাহাবাব। মাত্র দু'সপ্তাহ আগে মধ্য মোগাদিসুতে জঙ্গি হামলার ৩৫৮ জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় স্তম্ভিত সারা বিশ্ব। নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র। পুলিশ ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হোটেলটি ঘিরে ফেলেছে। প্রাথমিক সংবাদে প্রকাশ, বেশ কয়েকজন জঙ্গি নিহত হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে। রাজধানী জুড়ে চলছে তল্লাশি। সোমালিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে মোহম্মদ খোয়ালিম আদান জানান, ঘটনাস্থলেই ১৪ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী হোটেলটি সিল করে দিয়েছে। তাদের আশঙ্কা, বেশ কয়েকজন জঙ্গি অস্ত্র সহ হোটেলের ভেতরে রয়েছে। জঙ্গিদের আত্মঘাতী বিস্ফোরণে হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ি চুরমার হয়ে যায়। আশেপাশের ১০-১২টি বাড়িতে ফাটল ধরে। বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা।

প্রসঙ্গত সোমালিয়ায় জঙ্গিরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ইস্যু ভিন্ন হলেও সবচেয়ে বিপজ্জনক জঙ্গি গোষ্ঠী হল আল-সাহবাব। চলতি মাসের মাঝামাঝি এই জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট মোহমেদ আবদুল্লাহি মোহামেদ। দেশের বিভিন্ন প্রদেশ সফর করে তিনি জঙ্গি বিরোধী লড়াইয়ে জনগণের সমর্থন চেয়ে ছিলেন। কারণ জঙ্গিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে দেশের মধ্যে তৎপর ও সক্রিয় নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি। এই শক্তি তাঁকে উৎখাত করতে চায়। এরই জন্য সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত চিন্তিত। ইতিমধ্যে জঙ্গিদের দমনে সোমালিয়ার মাটিতে নেমেছে মার্কিন সেনা। তারা ২০টি ড্রোন নামিয়েছে জঙ্গিদের খোঁজে। বোঝা যাচ্ছে, এবার ইরাক, আফগানিস্তানে পর জঙ্গি বিরোধী যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে আফ্রিকা মহাদেশে।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ধরিলেন—

(১) হরি হরি বল রে বীণে!

(২) বিফলে দিন যায় রে বীণে, শ্রীহরির সাধন বিনে।

এইবার আর এক কীর্ত্তনিয়া, বেনোয়ারী, রূপ গাহিতেছেন। কিন্তু সদাই গান গাহিতে গাহিতে 'আহা! আহা!' বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। তাহাতে শ্রোতারা কেহ হাসে, কেহ বিরক্ত হয়। অপরাহ্ন হইয়াছে। ইতিমধ্যে বারান্দায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেই ছোট রথখানি ধবজা পতাকা দিয়া সুসজ্জিত করিয়া আনা হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম চন্দনচর্চিত ও বসন ভূষণ ও পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত হইয়াছেন। ঠাকুর বেনোয়ারীর কীর্ত্তন ফেলিয়া বারান্দায় রথাগ্রে গমন করিলেন,--ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রথের রজ্জু ধরিয়া একটু টানিলেন--তৎপরের রথাগ্রে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেছেন।

মেয়ে ভক্তেরা চিকের মধ্য হইতে দেখিতেছেন। সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহ ধারণ করিয়া ভক্তের জন্য আসিয়াছেন! কি করে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, তাই বুঝি শিখাতে এসেছেন! নাম করিতে করিতে অনেকক্ষণ পরে **সমাধি** ভঙ্গ হইল। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবচরণ আবার গান

দিনপঞ্জিকা

১৩ কার্ত্তিক, ভাঃ ৯কার্ত্তিক, **৩১ অক্টোবর,** ১৩ কাতি, সংবৎ ১১ কার্ত্তিক সুদি,১০ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৫৭। **মঙ্গলবার, একাদশী** দিবা ঘ ৩।৪মিঃ। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ঘ ৫।২৩ মিঃ। ধ্রুবযোগ সন্ধ্যা ঘ ৪।৪২ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ৩।৪ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ২।৫৬ গতে বালবকরণ। **জন্মে**—কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ঘ ১১।১৪ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ঘ ৫।৩২ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**—ত্রিপাদদোষ, দিবা ঘ ৩।৪ গতে চতুষ্পাদদোষ,শেষরাত্রি ঘ ৫।২৩ গতে দ্বিপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ৭।৯ গতে ৮।৩৩ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।৯ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৬।৩৩ গতে ৮।৯ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**—নাই। **বিবিধ**—একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন। দিবা ঘ ৩।৪ গতে মাসদগ্ধা। **উত্থানৈকাদশীর উপবাস। গোস্বামিমতে ও নিম্বার্কসম্প্রদায়মতে অদ্য একাদশীর উপবাস।** সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ,। দিবা ঘ ৩।৪ গতে **অনধ্যায়। গোস্বামিমতে নিয়মসেবা (একাদশ্যারম্ভকল্পে কার্ত্তিক ব্রত) সমাপন। গোস্বামিমতে ভীষ্মপঞ্চক ব্রতারম্ভ। অদ্য হইতে ১৭ই কার্ত্তিক দিবা ঘ ১১।১৬ মধ্যে বকপঞ্চক। বকপঞ্চক মধ্যে নদীর শীতল জলে স্নান কর্ত্তব্য এবং জীবহিংসা ও মাংসভক্ষণ নিষেধ। গোস্বামিমতে সায়ংসন্ধ্যায় শ্রীশ্রীহরিরউত্থান। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর তিরোধান দিবস। শহীদ স্মরণ দিবস। অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।২৬ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১। ৪৭মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ৫। ১ গতে ৫।৪৬ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—রাত্রি ঘ ৭।২৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৩ কার্ত্তিক, ভাঃ ৯ কার্ত্তিক,৩১ অক্টোবর, ১৩ কাতি, ১০ শফর। উঃ ঘ ৫।৪৫, অঃ ঘ ৪।৫৭ মঙ্গলবার,একাদশী দিঃ ঘঃ ৩।৪।১৩ কার্ত্তিক, পীর গাজী সুফি নূর মোহাম্মদ ইসালে সওয়াব, চট্টগ্রাম।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শিক্ষাভাবনায় পরিবর্তন এবং একজন পর্যবেক্ষকের অবদান

শুকদেব মন্ডল
(বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ, মানকর কলেজ, পূর্ব-বর্ধমান)
শেষ পর্ব

বর্ণ পরিচয় হয়েছে তো?' সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের রাগ হওয়ারই কথা। ততক্ষণে তিনি বলে দিয়েছেন -- ইদানিং শ্রেণিকক্ষগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি। তাই তাদের চিনে নাম মনে রাখা বেশ কঠিন হয়।

আশিসবরণ সামন্ত'র ভাবনার আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল—পড়াশোনা নয়, লেখাপড়া। 'পড়াশোনা' ব্যসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করলে হয় 'পড়া ও শোনা' দ্বন্দ্ব সমাস। এই ব্যাসবাক্যতে পড়বে এবং শুনবে। লেখার কোন প্রয়োজন থাকছে না। এই সমাসে কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। প্রয়োজন হবে লেখাপড়া শব্দটির। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করলে হয় 'লেখা ও পড়া' দ্বন্দ্ব সমাস। লেখা শব্দটি আগে, পরে পড়া। তাই, লেখার গুরুত্ব বেশি। সুতরাং লিখতে হবে। নিজের পড়া নিজে তৈরি করে কতটা প্রকৃতই বোধগম্য হয়েছে তা নিজে নিজেই পরীক্ষা করে দেখাতে গিয়ে করেছেন লাল ও নীল কালির কলমের যথাযথ ব্যবহার। যে পড়াটি স্কুলে হয়ে গেছে তা প্রকৃতই কতটা হয়েছে তা নিজেকে নিজেকেই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি একটি করে পৃথক খাতা তৈরি করে যে অধ্যায়টি পড়া সারা হয়ে গেছে তা কিরকম হয়েছে—জানতে হবে। ধরা যাক, ভূগোলের প্রথম অধ্যায়ের অনুশীলনীতে ১০টি প্রশ্ন আছে। বই বন্ধ করে কেবলমাত্র অনুশীলনীর দিকে নজর রেখে উত্তর লিখতে হবে। উত্তর লিখতে গিয়ে প্রথমে ব্যবহার করবে নীল কালির কলম এবং উত্তর লিখেছে ৫টি প্রশ্নের, যেগুলি পড়েছে লিখেছে। যেগুলি পারেনি লেখেনি। এবার যে প্রশ্নগুলি পারেনি বই খুলে সঠিক উত্তর খুঁজে ওই প্রশ্নগুলির উত্তর লাল কালির কলমে লিখতে হবে। লেখা সারা হয়ে গেলে লাল কালির উত্তরগুলি বার বার পড়ে এবং লিখে তৈরি করে নিতে হবে। কেননা এগুলি যে এখনও তার কাছে অজানা। এই অজানাকে জানতে হবে। তবেই প্রকৃত লেখাপড়া শেখা হবে। তা না হলে হবে—পড়া ও শোনা। যা অল্প দিনের মধ্যেই স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হবে।

তাঁর শিক্ষা ভাবনার আরও একটি দিক হল—মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা। যা আজ খুব প্রয়োজনীয়। তাই তো, সত্তরের দশকের শেষার্ধে শিক্ষকতা করাকালীন ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী একদিনে ২টি করে শ্রেণির 'বাণী পীঠ' চালু করেন এবং তা বর্তমান সময় পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন। বিদ্যালয়ের পরিদর্শন হিসাবে যখন যে জেলায় গেছেন সেখানেই বিভিন্ন মনীষীর বাণী সংকলন 'শাশ্বতবাণী' গ্রন্থটি প্রতিটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উপহার দিয়েছেন। লক্ষ্য একটাই, মনীষীদের বাণী থেকে পথ খুঁজতে সচেষ্ট হোক আমাদের ছাত্রছাত্রীরা। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে আরামবাগ মহকুমার মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত কর্মরত থেকে প্রতিটি বিদ্যালয়ে তিনি নিজ উদ্যোগে ইউনিফর্ম চালু করেন। তার আগে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যে ধরণের পোশাক পরে বিদ্যালয় আসত তা পরে সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যাওয়া যেতে পারে, বিদ্যালয়ে আসা যায় না। বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির কাছে প্রস্তাব উপস্থাপন করে এমনকী বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভায় তা অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন। এখনও উক্ত সময়ের বিদ্যালয়গুলির 'মিনিট বুক' খুললে বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

নিয়মিত অভিভাবক সভা আহ্বানের উদ্যোগ তাঁর প্রচেষ্টাতেই শুরু হয়। বছরে তিনবার অভিভাবক সভা আহ্বানের প্রস্তাব ছিল তাঁর। নিজে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অভিভাবক সভায় উপস্থিত থাকতেন।

বিদ্যালয়ে প্রতিদিন উপস্থিতির খাতায় সংখ্যায় উপস্থিতি করানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। আজ প্রথম যে ছাত্রটি এসেছে তার উপস্থিতি ১ সংখ্যায় নথিভুক্ত হবে। পরের দিন এলে ২, তারপরের দিন ৩ এবং না এলে ৩ই থাকবে। যেদিন আসবে সেদিন ৪ হবে। ফলে একজন শিক্ষার্থী কদিন বিদ্যালয়ে এসেছে তা যে কোনও সময়ে বলা যাবে। অভিভাবকসভায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর উপস্থিতি এবং পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা ছিল বাধ্যতামূলক। এককথায় বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। শিক্ষা বিষয়ে আশিসবরণ সামন্ত বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আজকাল কথায় কথায় শিক্ষাবিদ বলা হয় অনেককেই। তাঁদের না আছে শিক্ষা নিয়ে তেমন কোন গবেষণা এবং পুস্তক। কথায় কথায় 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কার। আশিসবরণ সামন্ত নীরবে কিন্তু তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন, এখনও যাচ্ছেন। কেননা, তিনি ফলের আশা না করেই কাজ করে চলেছেন এবং তিনি প্রকৃত শিক্ষাবিদ । শিক্ষা বিষয়ক তাঁর গ্রন্থগুলি হল (১) মনীষীদের অমর কথা (১৯৮১), (২) মাটি ও তার মানুষ (১৯৮৯), (৩) শাশ্বতবাণী (২০১১), (৪) শিক্ষা পরিদর্শন ও রূপায়ণ দর্পণ (২০০৬), (৫) খেলার মাঠে বই -এর পড়া (২০১৪), (৬) বিদ্যালয় শিক্ষায় নতুন দিশা (২০১৪)। প্রতিটি গ্রন্থই আজ বড়োই প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে 'শিক্ষা পরিদর্শন ও রূপায়ণ দর্পণ'—গ্রন্থটি একটি 'অ্যাকাডেমিক ম্যানুয়েল' বলা চলে। শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষক, অভিভাবক থেকে গবেষক প্রত্যেকের কাছে সবসময়ে রাখার মতো গ্রন্থ।

বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল খুবই স্বচ্ছ। লক্ষ্য ছিল প্রভুত্ব বিস্তার নয়—আত্মিক যোগসূত্র রচনা। পরিদর্শকদের জন্য তাঁর কয়েকটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।—

(১) এক একজন পরিদর্শক এক একজন বড় মাপের শিল্পী।

(২) পরিদর্শন একটি শিল্প।

(৩) পরিদর্শন খবরদারি নয়, সহযোগিতার সোপান।

(৪) পরিদর্শক শিক্ষককুলের বন্ধু, শিক্ষার্থীর অভিভাবক এবং অভিভাবককূলের মনের মানুষ।

(৫) পরিদর্শক আদর্শ, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা এবং সময়ানুবর্তিতার প্রতীক।

(৬) পরিদর্শক শিক্ষার্থীদের মানুষ হওয়ার পথ প্রদর্শক।

(৭) পরিদর্শক যেমন শিক্ষাদরদি, শিক্ষার্থীদরদি, শিক্ষকদরদি, ঠিক তেমনি মানবদরদি।

বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে আশিসবরণ সামন্ত ছিলেন প্রকৃত সফল। শিক্ষকতা করাকালীন তিনি যে ভাবনাগুলি নিজ বিদ্যালয়ে কার্যকর করেছিলেন, পরিদর্শক হিসাবে তা আরও ব্যাপকভাবে কার্যকর করেছিলেন। একটি বিদ্যালয়ে আটক না থেকে তিনি পরপর ছটি উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং তাঁর চিন্তাধারাকে আরও বিস্তারিত করেছেন। শিক্ষকতার পর তিনি বিভিন্ন পদাধিকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে সাতটি কর্মক্ষেত্রে তিনি কাজ করেছেন এবং সর্বত্রই তিনি নতুন কিছু করে দেখাতে চেয়েছেন। ১৯৮২ সালের অক্টোবর মাসে তিনি প্রথম বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন দেখার পর খেলাধূলার ক্লাস দেখলেন। পরে টিফিনের বিরতির পর আকস্মিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বারান্দায় এবং গাছের ছায়ার বসে করলেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। ছাত্রছাত্রীরাই তা পরিচালনা করল। কোনও প্রস্তুতি ব্যতিরেকে নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক এবং তাৎক্ষণিক বক্তৃতার ব্যবস্থা রেখে লটারির মাধ্যমে নাম ঘোষণা করে অনুষ্ঠানকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলতেন। প্রতিটি বিদ্যালয়েই কিন্তু পরিদর্শনকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করিয়ে শিক্ষার্থীদের মন জয় করে ফেলতেন। বিদ্যালয় ছুটির পর অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রছাত্রীরা যখন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে 'আবার কবে আসবেন' ব'লে তাঁর প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিত তখনই তো একজন পরিদর্শকের সব পাওয়া হয়ে যেত। প্রথম যোগদানের মাস থেকে শুরু করে অবসর গ্রহণের মাস পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

১৯৮৫ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মবর্ষ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রাজ্যের বিদ্যালয় পরিদর্শকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই। তখন আশিসবরণ সামন্ত হুগলি দেলার জাঙ্গিপাড়া পশ্চিমচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে কর্মরত। ১৯৮৫ সালে চক্রভিত্তিক একটি সাংস্কৃতিক সমিতি গঠন করেন এবং সূচি তৈরি করে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তা পালনের নির্দেশ দেন।

বিদ্যালয়স্তরের প্রতি বিষয়ের প্রথম স্থানাধিকারীদের নিয়ে গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে এবং পরে গ্রামপঞ্চায়েত স্তরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের নিয়ে চক্র অন্তের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করিয়ে রাজ্যে নজির সৃষ্টি করেছিলেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আজ থেকে ৩২ বছর আগে একক পরিকল্পনায় এবং উদ্যোগে এরকম এক বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা ভাবাই যায় না। বর্তমানে আশিসবরণ সামন্ত'র শিক্ষাভাবনা অনুসরণ করা খুবই জরুরি। এর মধ্যে অনেকগুলি বিষয় কিন্তু সরকারিভাবে গৃহীত হয়েছে। শিক্ষার স্বার্থে বাকি প্রস্তাবগুলি অবিলম্বে কার্যকর করা প্রয়োজন। সরকারের শিক্ষাবিভাগ কী করে তা দেখার অপেক্ষায় আছেন শিক্ষার জন্য নিবেদিত প্রাণ অসংখ্য মানুষ।

সুলভ আবাসনের জন্য অর্থসংস্থান

চরণ সিং
পর্ব ২

প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ঃ
সরাসরি বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব থেকে সরে আসছে সরকার। সরকার এখন মূলত ব্যবস্থাপকের ভূমিকা নিচ্ছে। সেই ১৯৫১ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হওয়ার সময় থেকেই দেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে আবাসন ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে তৈরি হয় জাতীয় ভবন সংস্থা বা National Buildings Organisation (NBO)। আবাসনের চাহিদা মেটাতে ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আবাসন ও নগরোন্নয়ন নিগম' বা Housing and Urban Development Corporation Ltd.--HUDCO। গৃহঋণ সংস্থাগুলির বিকাশের লক্ষ্যে জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৮৮ সালে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে করছাড়ের সুযোগ দেয়। ভাড়া দেওয়ার জন্য গৃহ নির্মাণে উৎসাহ দিতে বেশ কয়েকটি রাজ্যের সরকার পাট্টাদাতাদের স্বার্থরক্ষায় আইন প্রণয়ন করেছে। স্থাবর সম্পত্তি বা Real Estate ক্ষেত্রকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের জন্যও খুলে দেওয়া হয়েছে। রয়েছে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ। পরিকাঠামোসহ সংশ্লিষ্ট আরও নানা ক্ষেত্রেই বিদেশি বিনিয়োগ আসার পথ মসৃণ করে দেওয়া হয়েছে।

আবাসন ও গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রের প্রসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ গৃহঋণ বাবদ বিনিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে। এই ঋণ পেতে পারেন ব্যক্তি বিশেষ এবং সমবায়সহ বিভিন্ন সংগঠন। নির্বাচিত কয়েকটি আবাসন নির্মাণ সংস্থার বন্ড কিনেও এক্ষেত্রে টাকা ঢালতে পারে ব্যাঙ্কগুলি। ২০০৪ সাল থেকে বন্ধক বা মর্টগেজের ভিত্তিতে নিদর্শনপত্র বা সিকিউরিটির (MBS)মাধ্যমেও আবাসন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি বিনিয়োগ করতে পারছে। এই সব কারণে এবং সুদের হার সুবিধাজনক হওয়ায় বাড়ি তৈরির জন্য ঋণ নেওয়ার প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। সকলের জন্য আবাসন কর্মসূচীতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা। সুলভে আবাসন তৈরির উদ্যোগে এ দেশের সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চায় 'রাষ্ট্রসংঘের বিকাশ কর্মসূচী' বা UNDP। কম আয়ের মানুষ যাতে গৃহঋণ-এর সুবিধা পান, সেজন্য জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক বা NHB-র মাধ্যমে সহায়তা দিচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক।

অন্যান্য দেশের ছবি ঃ বেশ কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের জন্য অনেকটাই দায়ী গৃহনির্মাণ বা আবাসনক্ষেত্রে হঠাৎ চাহিদা হ্রাস। কোনও দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে গৃহনির্মাণ ও আবাসন ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। রিয়েল এস্টেট-এর বাড়বাড়ন্ত, আবার হঠাৎ করে পড়ে যাওয়া, দেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,স্পেন, আয়ারল্যান্ড এবং ব্রিটেনের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বলছে যে, আবাসন ক্ষেত্রের অতিরিক্ত বাড়বাড়ন্তের পর হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় উৎপাদন মার খেয়েছে। সমস্যা তৈরি হয়েছে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে। উন্নত দেশের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশেও তাই হওয়ার সম্ভাবনা। নির্মাণক্ষেত্রের বাড়াবাড়ি রকম ফুলে ফেঁপে ওঠার পর হঠাৎ বাজার খারাপ হলে মন্দা ডেকে আনতে পারে। উন্নত দেশগুলিতে গৃহঋণ-এর বাজার ২০০ বছরেরও পুরানো। ডেনমার্কে বন্ধক রেখে গৃহঋণ দেওয়ার রীতি চালু হয় ১৭৯৫ সাল নাগাদ। জার্মানিতে এ ধরণের ব্যবস্থাপনার সূচনা ১৭৬৯ সালে। অন্যদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এ ধরণের ব্যবস্থাপনা হালে গড়ে উঠেছে। উন্নত অর্থনীতিতে কভার্ড বন্ড, বন্ধকের বদলে নিদর্শনপত্র বা সিকিউরিটি-র মাধ্যমে গৃহঋণের ব্যবস্থা করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঋণের ওপর সুদের হার পরিবর্তনীয়। নির্ধারিত সময়ের আগে ঋণ শোধ দিলে জরিমানা দিতে হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বেশিরভাগ উন্নত দেশেই এল আই জি ভুক্তদের সুলভে আবাসনের সংস্থানের জন্য সরকার আইনানুগভাবে দায়বদ্ধ। তবে ইউরোপে, একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনা কার্যকর। সেখানে গৃহঋণের জন্য চুক্তিভিত্তিক সঞ্চয়ে সামিল হলে তার ওপর ভরতুকি মেলে। **ক্রমশ**

সম্পাদক সমীপেষু

খাই খাই এটাই এখন দাঁড়িয়েছে

কথায় বলে, বেশি খেলে বদহজম হয়ে যায়, আবার গ্যাসও হয় কখনো, কখনো মারাও যায়। তাই যা কিছুই খাই না কেন একটু কম খেলে শরীরটা ভাল থাকে। তাই গলা পর্যন্ত না খাওয়াটাই ভাল। আমরা এসব জানার পরেও অধিক পরিমানে খেয়ে ফেলি,আবার যদি পরের পয়সায় খাই তাহলে তো দেখার নেই। একেবারে কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে ফেলি। এটা মস্ত বড়ো দোষ। আমাদের আমন্ত্রণ করে, সেই আমন্ত্রণে আমরা যাই। যাঁদের অনুষ্ঠান হচ্ছে তাঁরা তো খাবার জন্য বারবার বলবেই, সেটাকেই ভদ্রতা বলে। তাই বলে আমরা লোভ সমলাতে না পেরে যা পাবো তাই খেয়ে নেবো, আবার একটা পার্সেলও চেয়ে নেবো। তারপরের কথাটা কী হবে। আজ লোভে পড়ে খেয়ে নিলাম। কালকে গ্যাসে ভরপুর হবে শরীরটা,তারপর ডাক্তার এসে বলবে, বড় কোনো হাসপাতালে ভর্তি করে দিন, অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। দেখা যায় কোনো কোনো সময়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যায়। তাই সামান্য ডাল-ভাত আর মাছ খেলে যদি শরীরটা ভালো থাকে, সেটাই খাবো। তার জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন লাগে ততটুকু উপায় করলেই জীবনটা আনন্দময় হয়ে থাকে। কোনো শত্রু পক্ষ এসেও কিছু করতে পারে না। কেউ অযথা বদনাম দিয়ে সম্মানটাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে না। অর্থ থাকাটা অবশ্যই প্রয়োজন। আরও বেশি করে অর্থ পাবার আশায় পরে যে ফলটা এসে যায়, তা খুবই মারাত্মক। শেষটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। যা পেয়েছি তার নাম ভালোবাসা। সেই ভালোবাসাটাকে কেন অকারণে বদনামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবো? কেনই বা আঙুল তুলে বলবে, এই বলাটার কেনই বা সুযোগ দেব। যেখানে মানুষের ভালোবাসা পেয়ে একটা জায়গা পেয়েছি, সেই জায়গাটাকে সম্মানের সঙ্গে রাখতে যদি অনেক কষ্ট হয়, সেই কষ্টটাকেও সহ্য করে নেবো। কোনো কিছুর জন্য সম্মানটাকে নষ্ট করব না। সম্মান হারিয়ে গেলে সেটা বোধহয় সারা জীবন ধরেও ঠিক করা যায় না। তাই যদি হাজার বার অনুরোধ করে, তারপরেও গলা পর্যন্ত না খাওয়াটাই ভালো। এতে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়ে যায়। কে শুনছে এসব কথা। বর্তমানে খাই খাই এত বেড়ে গেছে, শুধু খেয়ে যাচ্ছে আর যাচ্ছে। অ্যাসিডের কবলে পড়ে মারাও যাচ্ছে।

বিবেক রায় দে,
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বাদলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়